নদী ভাবনা ঃ দামোদর এবং তার পরিকল্পনার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা

কুন্তলা লাহিড়ী-দত্ত

"Rivers tell stories — since they connect people they can't fail to — and they can tell the biggest stories, of war and invasion, and the clash of races and theories".

Robert Haupt, *Last Boat to Astrakhan : A Russian Memoir, 1990-1996,* Random House, 1998.

নদী ঃ বাস্তবের ও কল্পনার

নদী কি ? সে কি বাস্তবের বিষয় না কি আমাদের কল্পনার ফসল ? নদী যে বাস্তবের পৃথিবীতে প্রকৃতভাবে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নদীর দুটি পাড় দিয়ে বাঁধা একটি খাত আছে, তাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে নদীকে অনুভব করা যায়, চোখে দেখা যায় ও ম্যাপে আঁকা যায়। ম্যাপে নদীর উপস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যায়ঃ তাকে পাঠক / পাঠিকার চোখের সামনে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। চোখে দেখার এই সহজ - সরল সুবিধের জন্য নদী কতকগুলি যেন সংখ্যায় পরিণত হয়, তাকে মাপা হয় নানা ভাবে, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বক্রতার গুণাবলী সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ফলে তার শারীরিক রূপের বহিঃপ্রকাশ যেটিকে চোখের সামনে দেখছি, সেটিই হয়ে ওঠে প্রধান। এই শারীরিক রূপ যত স্বাভাবিক বলে মনে হয়, ততই চাপা পড়ে যায় নদীকে কার বা কি চোখে দেখা হচ্ছে সেই বিষয়টি। অথচ সমাজ ও মানুষ নদীকে সতত গঠন করছে, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রচনা করছে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে নদী স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং তার নানা বর্ণনা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখেছে সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের সামনে নদী বিষয়ে বহু ভাবমূর্তি উপস্থাপিত হয়েছে – সেগুলিকে খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় সত্যি করে যে

নদী কি তা নিয়ে জটিলতা আছে। শুধু তাই নয়, নদীর কি হওয়া উচিত, এবং 'উপকরণ' হিসেবে আমরা নদীর জলকে 'সঠিকভাবে' কাজে লাগাতে চাইলে আমাদের কি করা দরকার – এ নিয়েও অনেকগুলি মত গড়ে উঠেছে। সুতরাং একথা মানতে হবে যে সমাজ ও ইতিহাস নদীকে গঠন করে, নানা ভাবে নদীকে দেখে। মনে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে যে নদীকে কল্পনা করার একটা 'সঠিক' রূপ আছে কি না। রাষ্ট্রের সুবৃহৎ অফিসার-ইঞ্জিনীয়ার-বিশেষজ্ঞ কুল ভারতের নদীগুলিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের থেকে ভিন্নভাবে দেখেছেন। এই দেখার মধ্যে যে ভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব, তা নিয়ে গবেষণাও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু সত্যি কি নদীকে কল্পনা করার, নদীভাবনার, একটি সঠিক ও শ্রেষ্ঠ উপায় আছে কি না, তা নিয়ে শেষ কথাটি এখনও বলা হয়নি। এখানে আসুন, আমাদের ঘরের পাশের অতি পরিচিত দামোদর নদের প্রসঙ্গ টেনে আমরা দেখার চেষ্টা করি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী কিভাবে তাদের নিজেদের মতো করে নদীকে দেখেছে। কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণ প্রতিমূর্তিকে সংশোধন করা বা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আদতে এরকম কোনও আদর্শ / সঠিক প্রতিমূর্তি থাকার সম্ভাবনাও কম। আমি এখানে দেখতে চাই ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে নদীকে কিভাবে ভাবা হয়েছে, এবং রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের কর্মসূচী কিভাবে সৃষ্টি করেছে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী দ্বি-বিভাগ, যেমন চিরাচরিত বনাম উন্নয়নমূলক, বাঁধ-বিরোধী বনাম বাঁধপন্থী, স্থানীয় বনাম বিশ্বজনীন, জীব কেন্দ্রিক বনাম মনুষ্য কেন্দ্রিক, এবং বড় বনাম ছোট। এটি আমি আমাদের চিরপরিচিত নদী (নাকি নদ ?) দামোদরের উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করছি।

1959 সালে দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের (ডি. ভি. সি.) ইঞ্জিনীয়ার শ্রী রাম স্বরূপ একটি প্রবন্ধ লেখেন যা প্রকাশিত হয় – *ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অফ পাওয়ার অ্যাণ্ড রিভার ভ্যালি ডেভেলাপমেন্ট* নামক সাময়িকীতে। বলাই বাহুল্য যে এই সাময়িকীটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণাধর্মী রচনার জন্য বিখ্যাত। রাম স্বরূপের প্রবন্ধের নাম ছিল 'প্রবলেম অফ ক্যানাল এক্সক্যাভেশন ইন দামোদর ভ্যালি করপোরেশন'। এই প্রবন্ধে তিনি বর্ণনা করেছেন কি ধরনের বড় বড় সমস্যার মধ্যে দিয়ে ডি. ভি. সি.র খাল কাটার কাজ হচ্ছিল, এবং সেসব সমস্যা কিভাবে মেটানো হচ্ছিল। তাঁর লেখায় রাম স্বরূপ বর্ণনা করেন ভারি বুলডোজার এনে কি ভাবে 'জমি সাফ' করা হল কারণ ঘন জঙ্গল ও পুকুরগুলোর জন্য নিম্ন দামোদর এলাকাটাকে জরিপ করা যাচ্ছিল না। এর পরে ভারি পাম্প ব্যবহার করে পুকুরগুলোর জল তুলে ফেলে দেওয়া হল এবং তাদের মধ্যবর্তী উঁচু পাড়গুলোকে কেটে সমান করে দেওয়া হল 'যাতে বুলডোজারের টায়ারের ক্ষতি না হয়'। বদ্বীপের নরম পলিমাটি এভাবে কঠিন করে তোলা হল যাতে মোটর স্ক্রেপার ব্যবহার করা যায়। ভূগর্ভস্থ জলের তল খুব উঁচু ছিল বলে মাটিতে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বেশ কয়েকদিন ধরে সেগুলো ফেলে রাখা হত আর মেশিন দিয়ে

তাদের পাড়গুলো এখানে-সেখানে ভরাতে হত। তবুও এই এলাকায় মেশিন ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ে কারণ ট্র্যাক্টর স্ক্রেপারগুলো এখানকার নরম কাদা মাটিতে আটকে যেত। তখন তাদের বহু কষ্ট করে টেনে সরাতে হত। এতসব কাণ্ড করার পরে আবার একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। দামোদরের দুই পাড় বরাবর তটবন্ধ (পাড়বাঁধ) নির্মাণ করার সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মাটির অভাব দেখা দিল। তখন কি আর করা, আরও কিছু চাষের জমি অধিগ্রহণ করা হল মাটির প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এই তটবন্ধগুলি আবার সৃষ্টি করল আরেক সমস্যা – উপনদীদের দামোদরের সঙ্গে মেশা ও শাখা নদীদের দামোদর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে এরা বাধা সৃষ্টি করল। এভাবে তটবন্ধ নির্মাণ করতে গিয়ে শালি নদী দামোদর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

শ্রী রামস্বরূপের এই লেখার মধ্যে আমরা যে নদীভাবনা দেখতে পাই তা নিশ্চয়ই সেসময়কার ভারতের জন্য 'সঠিক' দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নতুন স্বাধীন এই ভারত চাইছিল তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতা বাড়াতে, আধুনিকতার পথে চলতে এবং তার থেকে সবচেয়ে বেশি ফায়দা তুলতে। এই লাভ আপাতদৃষ্টিতে কাজে লাগবে 'জনসাধারণের', যেন এই জনসাধারণ একটা বিরাট সমধর্মী পিন্ড, এর মধ্যে শ্রেণী ও জাতের ভেদাভেদ নেই, দৈনিক অবস্থার পার্থক্য নেই, গ্রাম-শহর নেই, নারী-পুরুষ নেই – সব সমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়জয়কারে এই 'জনসাধারণের' সকলেই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

দামোদর ও ডি. ভি. সি.

কিন্তু দামোদর তো আর পাঁচটা নদীর সমতুল্য নয়। এই নদী এক এবং অদ্বিতীয় তার নানা গুণের সমাহারে। যেমন ধরুন এর নামই আমাদের বুঝিয়ে দেয়, এটি পুরুষ, অর্থাৎ পৌরুষ গুণবাচক এর নাম। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে দামোদর তার বিধ্বংসী বন্যা ও করুণাঘন রূপ – দুই-এর জন্যই পরিচিত ছিল। স্বভাবতই ভারতে আধুনিকতার পথ ধরে যখন 'নদী ট্রেনিং' শুরু হল তখন দামোদরকে নিয়ন্ত্রণ করার কথাই সর্বাগ্রে মনে এল। পূর্ব ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে, কয়লা ও ইস্পাত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, আদিবাসী-অধ্যুষিত পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে ৫৪১ কিলোমিটার লম্বা দামোদর বয়ে চলেছে। প্রায় চব্বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত দামোদর অববাহিকার দুই-তৃতীয়াংশ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমিতে, এবং নীচের এক - তৃতীয়াংশ অতি নীচু, বদ্বীপীয় বাংলায়। যে খাত ধরে দামোদর বইছে, তা গঙ্গার খাতের চেয়েও পুরনো; নিম্নগতিতে এসে বহু ধারায় (শাখা নদীতে) বিভক্ত হয়ে দামোদর মিলেছে তার চেয়ে বয়সে বহু নবীন হুগলির সঙ্গে। মালভূমির আদিবাসীদের কাছে দামোদর শ্রদ্ধার পাত্র। নিম্ন উপত্যকার কৃষিভিত্তিক বর্ণহিন্দু জনগোষ্ঠীগুলিও দামোদরকে ভয়-ভালোবাসা-সমীহ করে চলেছে বরাবর।

গল্পে-ছড়ায় লোকগাথায় এর অসংখ্য নমুনা ছড়িয়ে আছে। তা নিয়েই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দামোদরের নিবিড় সম্পৃক্তি। দামোদরের জল যোগাচ্ছে কোলকাতা বন্দরের জীবনদায়ী রক্ত। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে দামোদর শেষ গতিতে অনেকগুলি শাখায় ভাগ হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি অন্তর্দেশীয় বদ্বীপ। কিন্তু নদীর দুধারের তটবন্ধ ও চাষের জন্য নদীখাত ব্যবহার করে করে এখন এসব নদীর অনেকেই দামোদরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এদের নামের আগে 'মজা', 'কানা' প্রভৃতি বিশেষণ লাগানো হয়। দামোদরের নিম্ন উপত্যকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতি এলাকা — প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এখানে প্রায় ১,৩০০ লোক থাকে এবং এর প্রায় ৩৪ শতাংশ সরকারীভাবে চিহ্নিত দারিদ্র রেখার নীচে।

বর্ষাকালে বৃষ্টিবাহী বাতাসের গতিপথের সমান্তরালে অথচ ঠিক তার বিপরীত মুখে, অবস্থিত দামোদরের গতিপথ। দামোদরের বন্যার প্রধান কারণ এটিই। নিম্ন উপত্যকায় বৃষ্টিপাত করে বর্ষার মেঘগুলি যখন ছোটনাগপুরে বৃষ্টি দেয়, তখন সেই বৃষ্টি খুব দ্রুত ঢালু জমি বরাবর নীচে নেমে আসতে পারে। কিন্তু নীচের দিকে নদীগুলি তখনও ফুলে থাকে আগের বৃষ্টির জেরে। তার সঙ্গে যোগ হয় উচ্চ অববাহিকার এই অতিরিক্ত জল। সর্বোপরি, হুগলি নদী, যাতে দামোদর গিয়ে মিশছে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই বঙ্গোপসাগরে জল নিকাশ করতে পারে না। ফলে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সমুদ্রে পড়ার আগে নিম্ন উপত্যকায় বেশ ক'দিন জল জমে থাকে। এই নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে বন্যার দেখা প্রায়ই মেলে বলে তাকে ঘিরে নানা ধরণের 'মিথ' গত শতাব্দীতে গড়ে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ' কুল এসব মিথের অনেকগুলিকেই জিইয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে অন্যতম ধারণা হল বেশি বৃষ্টির ফলেই দামোদরের বন্যা। ১৯৪৩ সালের এক বড় ধরণের বন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কোলকাতা শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বেশ কয়েকদিনের জন্য। শহরের বড় বড় বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে গড়ে তোলা হল 'ফ্লাড এনকোয়ারি কমিটি'। এই কমিটি তার সুদীর্ঘ রিপোর্টে সিদ্ধান্ত নিল যে দামোদরের এই ঋতুগত প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং উপত্যকার নানা মানুষজনের উপকারে নানা ভাবে 'কাজে' লাগাতে হবে — চাষীরা পাবে সেচের জন্য জল, শহর ও কোলিয়ারি পাবে শিল্পের বা পানীয় জল, জলবিদ্যুৎ শক্তি এই গলি — শহর শিল্পের অর্থনীতিকে এনার্জি যোগাবে, নিম্ন উপত্যকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব কমবে, নাবা খালগুলির মাধ্যমে মানুষ ও পণ্যের চলাচলের সুবিধে হবে, মাছের চাষে গরীব চাষীর খাদ্যে প্রোটিনের যোগান বাড়বে, আর মাঝে মাঝে সে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বাঁধের পেছনের জলাধারে নৌকায় প্রমোদ বিহারে যাবে। এই মহান স্বপ্নকে সার্থক করতে ১৯৪৮ সালে একটি আইনের মাধ্যমে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হল। এর উদ্দেশ্য হল 'বহুমুখী জল সম্পদ উন্নয়ন'।

খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে দামোদরে বহুমুখী নদী উপত্যকা উন্নয়নের

পরিকল্পনার পেছনে দু'টি মূল নীতি :

১) শুকনো ঋতুতে নদীতে প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বর্ষার অতিরিক্ত জল বড় বড় জলাধারে উচ্চভূমিতেই জমিয়ে রাখতে হবে এবং বাঁধ থেকে প্রয়োজনমতো ছাড়া চলবে; এবং

২) নদীর গতি বরাবর উঁচু করে পাশের তটদু'টি বেঁধে দেওয়া যাতে নদী তার খাতের আশপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

সত্যি কথা বলতে কি ঔপনিবেশিক কাল থেকেই দামোদরের স্বাভাবিক প্রবাহে নানা ধরণের হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে বর্ধমানে নীচু করে অ্যান্ডারসন ওয়্যার নির্মাণ করে তার থেকে ইডেন খাল কেটে বার করা হল নীচের চাষের জমিগুলোর দিকে। এক কালে এই নদী ছোটনাগপুর মালভূমি ও বাংলার বদ্বীপীয় এলাকার মধ্যে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য বহন করত। দামোদরের তীরবর্তী গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা আজও গল্প করেন বড় বড় মহাজনী নৌকো কিভাবে ধান বোঝাই হয়ে নদীতে চলাফেরা করত। দামোদরের কূলের জনবসতিগুলি খ্যাতি লাভ করেছিল নদী বন্দর হিসেবে। তাদের মধ্যে কাঞ্চননগর তো তার শিল্পের জন্যও খ্যাতি লাভ করেছিল। হুগলির জোয়ার প্রায় বর্ধমান শহর পর্যন্ত এসে পৌঁছাতো পঞ্চাশের দশকের গোড়া পর্যন্ত। বর্ধমান মহারাজা প্রথম নদীর ধারে তটবন্ধ নির্মাণ শুরু করেন বর্ধমান শহরকে দামোদরের বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে। এর জন্যে নদীর বাঁদিকের তটবন্ধ গড়ে তোলা হল বেশি উঁচু আর শক্ত করে, আর ডানদিকের তটবন্ধের জায়গায় জায়গায় হানা দিয়ে বর্ষার অতিরিক্ত জল নিকাশীর সুবিধে রইল। ফলে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের লোকেরা হয়ে পড়ল কিছুটা বাধাগ্রস্ত — চট করে নদী পেরিয়ে বর্ধমান শহরে আসার দিক থেকে, বর্ষার জল ধারণের দিক থেকে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তো ঘটেই।

নতুন স্বাধীন ভারতে ডি. ভি. সি. প্রতিষ্ঠা করা হয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের উপকার করার জন্য। গোটা বিশ্ব জুড়ে খোঁজ করে বেছে নেওয়া হল ডব্লিউ. এল. ভূরডুইন সাহেবকে। ভূরডুইন ছিলেন আমেরিকার টেনেসী ভ্যালি অথরিটির একজন প্রধান ইঞ্জিনীয়ার। তিনি গভীর ভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে পেশ করেন 'টেকনিক্যাল রিপোর্ট অন ইউনিফায়েড ডেভেলাপমেন্ট অফ দ্য দামোদর ভ্যালি' এবং প্রস্তাব করেন যে দামোদরে উচ্চ অববাহিকার উপনদীগুলির উপরে আটটি বাঁধ নির্মাণ করা হবে — মাইথন, কোনার, তিলাইয়া, পাঞ্চেত, দেওলবাড়ি, বোকারো এবং বেরমো। এই প্রতিটি বাঁধে থাকবে একটি করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, এছাড়া একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকবে বোকারো-তে। পুরো সিস্টেমটি এসে মিলবে দুর্গাপুর ব্যারেজে, সমতলভূমির মুখে, যেখান থেকে দু'টি প্রধান খাল (ও তাদের শাখাসমূহ) নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে